ভক্ত

অরূপবাবু—অরূপরতন সরকার—পুরী এসেছেন এগারো বছর পরে। শহরে কিছু কিছু পরিবর্তন চোখে পড়েছে—কিছু নতুন বাড়ি, নতুন করে বাঁধানো কয়েকটা রাস্তা, দু-চারটে ছোট-বড় নতুন হোটেল—কিন্তু সমুদ্রের ধারটায় এসে বুঝতে পারলেন এ জিনিস বদলাবার নয়। তিনি যেখানে এসে উঠেছেন, সেই সাগরিকা হোটেল থেকে সমুদ্র দেখা না গেলেও, রাত্তিরে বাসিন্দাদের কলরব বন্ধ হয়ে গেলে দিব্যি ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দ শুনে কালতো অরূপবাবু বেরিয়েই পড়লেন। কালই তিনি পুরীতে এসেছেন ; দিনে কিছু কেনাকাটার ব্যাপার ছিল তাই আর সমুদ্রের ধারে যাওয়া হয়নি। রাত্তিরে গিয়ে দেখলেন অমাবস্যার অন্ধকারেও ঢেউয়ের ফেনা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অরূপবাবুর মনে পড়ল ছেলেবেলায় কোথায় জানি পড়েছিলেন যে সমুদ্রের জলে ফসফরাস থাকে, আর সেই কারণেই অন্ধকারেও ঢেউগুলো দেখা যায়। ভারী ভালো লাগল অরূপবাবুর এই আলোমাখা রহস্যময় ঢেউ দেখতে। কলকাতায় তাঁকে দেখলে কেউ ভাবুক বলে মনে করবে না। তা না করুক। অরূপবাবু নিজে জানেন তাঁর মধ্যে এককালে জিনিস ছিল। সে সব যাতে কাজের চাপে একেবারে ভোঁতা না হয়ে যায় তাই তিনি এখনও মাঝে মাঝে গঙ্গার ধারে, ইডেন বাগানে গিয়ে বসে থাকেন, গাছ দেখে জল দেখে ফুল দেখে আনন্দ পান, পাখির গান শুনে চিনতে চেষ্টা করেন সেটা দোয়েল না কোয়েল না পাপিয়া। অন্ধকারে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে তাঁর মনে হল যে ষোলো বছরের চাকুরি জীবনের অনেকখানি অবসাদ যেন দূর হয়ে গেল।

আজ বিকেলেও অরূপবাবু সমুদ্রের ধারে এসেছেন। খানিকদূর হেঁটে আর হাঁটতে মন চাইছে না, কে এক গেরুয়াধারী সাধুবাবা বা গুরুগোছের লোক হনহনিয়ে বালির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, তার পিছনে একগাদা মেয়ে-পুরুষ

চেলা-চামুণ্ডা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, অরূপবাবুর কাছে এ দৃশ্য পরম উপভোগ্য বলে মনে হচ্ছে, এমন সময় তাঁর বাঁ দিক থেকে কচি গলায় একটি প্রশ্ন হাওয়ায় ভেসে তাঁর কানে এল—

'"খোকনের স্বপ্ন" কি আপনার লেখা ?'

অরূপবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একটি সাত-আট বছরের ছেলে, পরনে সাদা সার্ট আর নীল প্যান্ট, হাতের কনুই অবধি বালি। সে ঘাড় উঁচিয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। অরূপবাবুর উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছেলেটি বলল, 'আমি "খোকনের স্বপ্ন" পড়েছি। বাবা জন্মদিনে দিয়েছিল। আমার...আমার...

'বলো, লজ্জা কী, বলো।'

এবার একটি মহিলার গলা।

ছেলেটি যেন সাহস পেয়ে বলল, 'আমার খুব ভালো লেগেছে বইটা।'

এবার অরূপবাবু মহিলাটির দিকে দৃষ্টি দিলেন। বছর ত্রিশ বয়স, সুশ্রী চেহারা, হাসি হাসি মুখ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন, আর এক পা দু পা করে এগিয়ে আসছেন।

অরূপবাবু ছেলেটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'না খোকা, আমি কোনো বইটই লিখিনি। তুমি বোধহয় ভুল করছ।'

ভদ্রমহিলা যে ছেলেটির মা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুজনের চেহারায় স্পষ্ট আদল আছে, বিশেষ করে খাঁজকাটা থুতনিটায়।

অরূপবাবুর কথায় কিন্তু মহিলার মুখের হাসি গেল না। তিনি আরো এগিয়ে এসে আরো বেশি হেসে বললেন, 'আমরা শুনেছি আপনি লোকজনের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসেন না। আমার এক দেওর আপনাকে একটা অনুষ্ঠানে সভাপতি হবার অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিল ; আপনি উত্তরে জানিয়েছিলেন ওসব আপনার একেবারেই পছন্দ না। এবারে কিন্তু আমরা আপনাকে ছাড়ছি না। আপনার লেখা আমাদের ভীষণ ভালো লাগে।যদিওছোটদের জন্য লেখেন কিন্তু আমরাও পড়ি।'

"খোকনের স্বপ্ন" বইয়ের লেখক যিনিই হ'ন না কেন, মা ও ছেলে দুজনেই যে তাঁর সমান ভক্ত সেটা বুঝতে অরূপবাবুর অসুবিধা হল না। এমন একটা বেয়াড়া অবস্থায় তাঁকে পড়তে হবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। এদের ধারণা যে ভুল সেটা জানানো দরকার, কিন্তু সরাসরি কাঠখোট্টাভাবে জানালে এরা কষ্ট পাবেন ভেবে অরূপবাবু কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়লেন। আসলে অরূপবাবুর মনটা ভারী নরম। একবার তাঁর ধোপা গঙ্গাচরণ তাঁর একটা নতুন আদ্দির পাঞ্জাবিতে ইস্তিরির দাগ লাগিয়ে সেটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। অন্য কেউ হলে গঙ্গাচরণকে দু-এক ঘা কিল চড় খেতে হত নির্ঘাত। অরূপবাবু কিন্তু ধোপার করুণ কাঁচুমাচু ভাব

দেখে শুধু একটিবার মোলায়েমভাবে 'ইস্তিরিটা একটু সাবধানে করবে তো' বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর এই দরদী মনের জন্যই আপাতত আর কিছু না বলে বললেন, 'ইয়ে—আমি যে খোকনের স্বপ্নের লেখক সে-বিষয়ে আপনি এতটা শিওর হচ্ছেন কী করে?'

মহিলা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বাঃ—সেদিনই যুগান্তরে ছবি বেরোল না। বাংলাভাষায় বছরের শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক হিসেবে আপনি আকাদেমি পুরস্কার পেলেন, রেডিওতে বলল, আর তার পরদিনইতো কাগজে ছবি বেরোল। এখন শুধু আমরা কেন, অনেকেই অমলেশ মৌলিকের চেহারা জানে।'

অমলেশ মৌলিক। নামটা শোনা, কিন্তু ছবিটা অরূপবাবু দেখেননি। এতই কি চেহারার মিল? অবিশ্যি আজকালকার খবরের কাগজের ছাপায় মুখ অত পরিষ্কার বোঝা যায় না।

'আপনি পুরীতে আসবেন সে খবর রটে গেছে যে,' মহিলা বলে চললেন। 'আমরা সেদিন সী-ভিউ হোটেলে গেলাম। আমার স্বামীর এক বন্ধু কাল পর্যন্ত ওখানে ছিলেন। তাঁকে হোটেলের ম্যানেজার নিজে বলেছেন যে আপনি বিষ্যুদবার আসছেন। আজই তো বিষ্যুদ। আপনি সী-ভিউতে উঠেছেন তো?'

'অ্যাঁ? ও—না। আমি, ইয়ে, শুনেছিলাম ওখানের খাওয়াটা নাকি তেমন সুবিধের না।'

'ঠিকই শুনেছেন। আমরাও তো তাই ভাবছিলাম—এত হোটেল থাকতে আপনার মতো লোক ওখানে উঠছেন কেন। শেষ অবধি কোথায় উঠলেন?'

'আমি আছি...সাগরিকাতে।'

'ওহো। ওটা তো নতুন। কেমন হোটেল?'

'চলে যায়। কয়েকদিনের ব্যাপার তো।'

'কদিন আছেন?'

'দিন পাঁচেক।'

'তাহলে একদিন আমাদের ওখানে আসুন। আমরা আছি পুরী হোটেলে। কত লোক যে আপনাকে দেখবার জন্য বসে আছে। আর বাচ্চাদের তো কথাই নেই। ওকি, আপনার পা যে ভিজে গেল।'

ঢেউ যে এগিয়ে এসেছে সেদিকে অরূপবাবুর খেয়ালই নেই। শুধু পা ভিজছে বললে ভুল হবে ; এই হাওয়ার মধ্যে অরূপবাবু বুঝতে পারছেন তাঁর সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। প্রতিবাদ করার সুযোগটা যে কখন কেমন করে ফস্‌কে গেল সেটা তিনি বুঝতেই পারলেন না। এখন যেটা দরকার সেটা হল এখান থেকে সরে পড়া। কেলেঙ্কারিটা কতদূর গড়িয়েছে সেটা নিরিবিলি বসে ভাবতে না পারলে বোঝা যাবে না।

'আমি এবার...আসি...'

'নতুন কিছু লিখছেন নিশ্চয়।'

'নাঃ। এখন, মানে, বিশ্রাম।'

'আবার দেখা হবে। আমার স্বামীকে বলব। কাল বিকেলে আসছেন তো এদিকে?'...

সী-ভিউ-এর ম্যানেজার বিবেক রায় সবেমাত্র গালে একটি গুণ্ডিপান পুরেছেন এমন সময় অরূপবাবু তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

'অমলেশ মৌলিকমশায়ের কি এখানে আসার কথা আছে?'

'উঁ'

'এখনো আসেননি ?'

'উঁহু'

'কবে...আসবেন...সেটা ?'

'মোঙ্গোবা। টেরিগ্রাঁ এয়েহে। ক্যাঁও ?'

মঙ্গলবার। আজ হল বিষ্যুদ। অরূপবাবু আছেন ওই মঙ্গলবার পর্যন্তই। টেলিগ্রাম এসেছে মানে মৌলিকমশাই বোধহয় শেষ মুহূর্তে কোনো কারণে আসার তারিখ পেছিয়েছেন।

ম্যানেজারকে জিগ্যেস করে অরূপবাবু জানলেন তাঁর অনুমান ঠিকই, আজই সকালে আসার কথা ছিল অমলেশ মৌলিকের।

বিবেকবাবুর 'ক্যাঁও'-এর উত্তরে অরূপবাবু বললেন যে তাঁর অমলেশবাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিল। তিনি মঙ্গলবার দুপুরে এসে খোঁজ করবেন।

সী-ভিউ হোটেল থেকে অরূপবাবু সোজা চলে গেলেন বাজারে। একটি বইয়ের দোকান খুঁজে বার করে অমলেশ মৌলিকের লেখা চারখানা বই কিনে ফেললেন। খোকনের স্বপ্ন পাওয়া গেল না ; কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। এই চারখানাই যথেষ্ট। দুটো উপন্যাস, দুটো ছোট গল্পের সংকলন।

নিজের হোটেলে ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল সাড়ে ছ'টা। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা ঘর, তার বাঁ দিকে ম্যানেজারের বসার জায়গা, ডান দিকে একটা দশ ফুট বাই আট ফুট জায়গায় একটা বেঞ্চি ও দুটো চেয়ার পাতা। চেয়ার দুটিতে দুজন ভদ্রলোক বসা, আর বেঞ্চিতে দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে, তাদের কারুরই বয়স দশের বেশি না। ভদ্রলোক দুজন অরূপবাবুকে দেখেই হাসি হাসি মুখ করে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে ঘাড় নাড়তেই তারা সলজ্জ ভাবে অরূপবাবুর দিকে এগিয়ে এসে টিপ্ টিপ্ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। অরূপবাবু বারণ করতে গিয়েও পারলেন না।

এদিকে ভদ্রলোক দুটিও এগিয়ে এসেছেন। তাদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমরা পুরী হোটেল থেকে আসছি। আমার নাম সুহৃদ সেন, আর ইনি মিস্টার গাঙ্গুলী। মিসেস ঘোষ বললেন আজ আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, আর আপনি এইখেনে আছেন, তাই ভাবলুম...'

ভাগ্যে বইগুলো ব্রাউন কাগজে বেঁধে দিয়েছিল, নাহলে নিজের বই দোকান থেকে কিনে এনেছে জানতে পারলে এরা না-জানি কী ভাবত।

অরূপবাবু এদের সব কথাতেই ঘাড় নাড়লেন। প্রতিবাদ যে এখনো করা যায় না তা নয়। এমন আর কী ? শুধু বললেই হল—'দেখুন মশাই, একটা বিশ্রী গণ্ডগোল হয়ে গেছে। আমি নিজে অমলেশ মৌলিকের ছবি দেখিনি, তবে ধরে

নিচ্ছি তাঁর সঙ্গে আমার চেহারার কিছুটা মিল আছে। হয়ত তাঁরও সরু গোঁফ আছে, তাঁরও কোঁকড়া চুল, তাঁরও চোখে এই আমারই মতো চশমা। এটাও ঠিক যে তাঁরও পুরীতে আসার কথা আছে। কিন্তু দোহাই আপনাদের, আমি সে-লোক নই। আমি শিশু সাহিত্যিক নই। আমি কোনো সাহিত্যিকই নই। আমি লিখিই না। আমি ইনসিওরেন্সের আপিসে চাকরি করি। নিরিবিলিতে ছুটি ভোগ করতে এসেছি, আপনারা দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। আসল অমলেশ মৌলিক মঙ্গলবার সী-ভিউতে আসছেন। আপনারা সেখানে গিয়ে খোঁজ করে দেখতে পারেন।'

কিন্তু সত্যিই কি এইটুকু বললেই ল্যাঠা চুকে যায়? একবার যখন এদের মগজে ঢুকেছে যে তিনিই অমলেশ মৌলিক, আর প্রথমবারের প্রতিবাদে যখন কোনো কাজ হয়নি, তখন সী-ভিউ-এর ম্যানেজার টেলিগ্রাম দেখালেই কি এদের ভুল ভাঙবে? এরা তো ধরে নেবে যে ওটা হল মৌলিক মশায়ের একটা কারসাজি। আসলে তিনিই ছদ্মনামে এসে রয়েছেন সাগরিকায়, আর আসার আগে সী-ভিউকে একটা ভাঁওতা টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন নিজের নামে, লোকের উৎপাত এড়ানোর জন্য।

প্রতিবাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বাধার সৃষ্টি করল ওই তিনটি বাচ্চা। তারা তিনজনে হাঁ করে পরম ভক্তিভরে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে অরূপবাবুর দিকে। প্রতিবাদের নামগন্ধ পেলে এই তিনটি ছেলেমেয়ের আশা আনন্দ উৎসাহ মুহূর্তে উবে যাবে।

'বাবুন, তোমার কী জানবার আছে সেটা জেনে নাও অমলেশবাবুর কাছে!' দুটি ছেলের মধ্যে যেটি বড় তাকে উদ্দেশ করে কথাটা বললেন সুহৃদ সেন।

অরূপবাবু প্রমাদ গুনলেন। আর পালাবার রাস্তা নেই। বাবুন ছেলেটি ঘাড় কাত করে দুহাতের আঙুল পরস্পরের সঙ্গে পেঁচিয়ে প্রশ্ন করার জন্য তৈরি।

'আচ্ছা, খোকনকে যে বুড়োটা ঘুম পাড়িয়ে দিল সে কি ম্যাজিক জানত?'

চরমসংকটের মধ্যে অরূপবাবু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে তাঁর মাথায় আশ্চর্যরকম বুদ্ধি খেলছে। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বাবুনের কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'তোমার কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয় জানত।'

অন্য দুটি বাচ্চাও সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ জানত, ম্যাজিক জানত!'

'ঠিক কথা।'—অরূপবাবু এখন সটান সোজা।—'তোমরা যেরকম বুঝবে সেটাই ঠিক। আমার যা বলার সে তো আমি লিখেই দিয়েছি। বোঝার কাজটা তোমাদের। যেরকম বুঝলে পরে গল্পটা তোমাদের ভালো লাগবে, সেটাই ঠিক

আর সব ভুল।'

তিন বাচ্চাই অরূপবাবুর কথায় ভীষণ খুশি হয়ে গেল। যাবার সময় সুহৃদ সেন অরূপবাবুকে নেমন্তন্ন করে গেলেন। পুরী হোটেলে এসে রাত্তিরে খাওয়া। আটটি বাঙালী পরিবার সেখানে এসে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে আছে যারা সকলেই অমলেশ মৌলিকের ভক্ত। অরূপবাবু আপত্তি করলেন না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছেন যে অন্তত সাময়িকভাবে তাঁকে অমলেশ মৌলিকের ভূমিকায় অভিনয় করতেই হবে। তার পরিণাম কী হতে পারে সেটা ভাববার সময় এখন নেই। শুধু একটা কথা তিনি বার বার বলে দিলেন সুহৃদবাবুকে—

'দেখুন মশাই, আমি সত্যিই বেশি হৈ চৈ পছন্দ করি না। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যেসটাই নেই। তাই বলছি কী—আমি যে এখানে রয়েছি সে খবরটা আপনারা দয়া করে আর ছড়াবেন না।'

সুহৃদবাবু কথা দিয়ে গেলেন যে আগামীকাল নেমন্তন্নের পর তাঁরা অরূপবাবুকে আর একেবারেই বিরক্ত করবেন না আর অন্যেও যাতে না করে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

রাত্রে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে বিছানায় শুয়ে অরূপবাবু অমলেশ মৌলিকের 'হাবুর কেরামতি' বইখানা পড়তে শুরু করলেন। এছাড়া অন্য তিনটে বই হল—টুটুলের অ্যাডভেঞ্চার, কিস্তিমাত ও ফুলঝুরি। শেষের দুটো ছোট গল্প সংকলন।

অরূপবাবু সাহিত্যিক না হলেও, চাকরি জীবনের আগে, বিশেষ করে ইস্কুলে থাকার শেষ তিনটে বছর, দেশী ও বিদেশী অনেক ছোটদের গল্পের বই পড়েছেন। অ্যাদ্দিন পরে ঊনচল্লিশ বছর বয়সে নতুন করে ছোটদের বই পড়ে তাঁর আশ্চর্য লাগল এই দেখে যে ছেলেবেলায় পড়া অনেক গল্পই তাঁর এখনো মনে আছে, আর সে সব গল্পের সঙ্গে মাঝে মাঝে অমলেশ মৌলিকের গল্পের এখানে সেখানে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

বড় বড় হরফে ছাপা একশো সোয়াশো পাতার চারখানা বই শেষ করে অরূপবাবু যখন ঘরের বাতিটা নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন ততক্ষণে সাগরিকা হোটেল নিঝুম নিস্তব্ধ। সমুদ্রের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত কত হল? বালিশের পাশ থেকে হাতঘড়িটা তুলে নিলেন অরূপবাবু। তাঁর বাবার ঘড়ি। সেই আদ্যিকালের রেডিয়াম ডায়াল। সমুদ্রের ফেনার মতোই অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। বেজেছে পৌনে একটা।

সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পাওয়া শিশুসাহিত্যিক অমলেশ মৌলিক। ভাষা ঝরঝরে, লেখার কায়দা আছে, গল্পগুলো একবার ধরলে শেষ না করে ছাড়া যায়

না। কিন্তু তাও বলতে হয় মৌলিক মশায়ের মৌলিকত্বের অভাব আছে। কত রকম লোক, কত রকম ঘটনা, কত রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা তো আমরা হামেশাই শুনি ; আমাদের নিজেদের জীবনেও তো কতরকম ঘটনা ঘটে ; সেই সবের সঙ্গে একটু কল্পনা মিশিয়ে দিলেই তো গল্প হয়ে যায়। তাহলে অন্যের লেখা থেকে এটা ওটা তুলে নেবার দরকার হয় কেন ?

অরূপবাবুর মনে অমলেশ মৌলিক সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাটা জমে উঠেছিল, তার খানিকটা কমে গেল। সেই সঙ্গে তাঁর মনটাও খানিকটা হালকা হয়ে গেল। কাল থেকে তিনি আরেকটু স্বচ্ছন্দে মৌলিকের অভিনয়টা করতে পারবেন।

পুরী হোটেলের পার্টিতে অমলেশ মৌলিকের ভক্তদের ভক্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। অরূপবাবু ইতিমধ্যে আরেকটি দোকান থেকে খোকনের স্বপ্ন বইটা জোগাড় করে পড়ে ফেলেছিলেন। ফলে তেরো জন শিশু ভক্তের তিনশো তেত্রিশ রকম প্রশ্নের উত্তর নিজের মনের মতো করে দিতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। পার্টি শেষ হবার আগেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে মধুচাটাবাবু বলে ডাকতে আরম্ভ করল, কারণ অরূপবাবু তাদের শেখালেন যে মৌ মানে মধু, আর 'লিক্' হল ইংরেজি কথা, যার মানে চাটা। এটা শুনে ডক্টর দাশগুপ্ত মন্তব্য করলেন, 'মধু তো আপনি সৃষ্টি করছেন, আর সেটা চাটছে তো এইসব ছেলেমেয়েরা।' তাতে আবার তাঁর স্ত্রী সুরঙ্গমা দেবী বললেন, 'শুধু ওরা কেন, আমরাও।'

খাওয়া-দাওয়ার পরে দুটো ব্যাপার হল। এক, বাচ্চারা অরূপবাবুকে ধরে বসল তাঁকে অন্তত একটা গল্প বলতেই হবে। তাতে অরূপবাবু বললেন মুখে মুখে বানিয়ে গল্প বলার অভ্যাস তাঁর নেই, তবে তিনি তাঁর নিজের ছেলেবেলার একটা মজার ঘটনা বলবেন। ছেলেবেলায় অরূপবাবুরা থাকতেন বাঞ্ছারাম অক্রূর দত্ত লেনে। তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁদের বাড়ি থেকে একদিন একটা দামী ট্যাঁক ঘড়ি চুরি যায়। চোর ধরার জন্য অরূপবাবুর বাবা বাড়িতে এক 'কুলোঝাড়া' ডেকে আনেন। এই কুলোঝাড়া একটা কাঁচিকে চিমটের মতো ব্যবহার করে তাই দিয়ে একটা কুলোকে শূন্যে তুলে ধরে তার উপর মুঠো মুঠো চাল ছুঁড়ে মন্ত্র প'ড়ে বাড়ির নতুন চাকর নটবরকে চোর বলে ধরে দেয়। অরূপবাবুর মেজো কাকা যখন নটবরের চুলের মুঠি ধরে তার পিঠে একটা কিল বসাতে যাবেন, ঠিক সেই সময় ট্যাঁক ঘড়িটা বেরিয়ে পড়ে একটা বিছানার চাদরের তলা থেকে।

হাততালির মধ্যে গল্প শেষ করে অরূপবাবু বাড়ি যাবেন মনে করে চেয়ার ছেড়ে উঠতেই চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, যাবেন না যাবেন না।' তারপর তারা দৌড়ে গিয়ে যে যার ঘর থেকে অমলেশ মৌলিকের

লেখা সাতখানা নতুন কেনা বই এনে তাঁর সামনে ধরে বলল, 'আপনার নাম লিখে দিন, নাম লিখে দিন !'

অরূপবাবু বললেন, 'আমি তো ভাই বইয়ে নাম সই করি না !—কক্ষনো করিনি। আমি এগুলো নিয়ে যাচ্ছি ; প্রত্যেকটাতে একটা করে ছবি এঁকে দেব। তোমরা পরশু বিকেল সাড়ে চারটের সময় আমার হোটেলে এসে বইগুলো নিয়ে যাবে।'

যাদের বই তারা আবার সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।—'সইয়ের চেয়ে ছবি ঢের ভালো, অনেক ভালো।'

অরূপবাবু ইস্কুলে থাকতে দুবার ড্রইংয়ে প্রাইজ পেয়েছিলেন। সেই থেকে যদিও আর আঁকেননি, কিন্তু একদিন একটু অভ্যেস করে নিলে কি মোটামুটি যা হোক কিছু এঁকে দেওয়া যাবে না ?

পরদিন শনিবার ভোরবেলা অরূপবাবু তাঁর ডটপেন আর বইগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নুলিয়া বস্তির দিকে গিয়ে দেখলেন সেখানে দেখে দেখে আঁকবার অনেক জিনিস আছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেল। একটা বইয়ে আঁকলেন কাঁকড়ার ছবি, একটাতে আঁকলেন তিনটে ঝিনুক পাশাপাশি বালির উপর পড়ে আছে, একটাতে আঁকলেন দুটো কাক, একটাতে মাছ ধরা নৌকো, একটাতে নুলিয়ার বাড়ি, একটাতে নুলিয়ার বাচ্চা, আর শেষেরটায় আঁকলেন চোঙার মতো টুপি পরা একটা নুলিয়া মাছ ধরার জাল বুনছে।

রবিবার বিকেলে ঠিক সাড়ে চারটের সময় তাঁর হোটেলে এসে ঝুনি, পিন্টু, চুমকি, শান্তনু, বাবুন, প্রসেনজিৎ আর নবনীতা যে যার বই ফেরত নিয়ে ছবি দেখে ফুর্তিতে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে অরূপবাবু হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে তাঁর মনের খুশি ভাবটা চলে গিয়ে তার জায়গায় একটা দুশ্চিন্তার ভাব বাসা বেঁধেছে। 'আমি অমলেশ মৌলিক'—এ কথাটা যদিও তিনি একটি বারও কারুর সামনে নিজের মুখে উচ্চারণ করেননি, তবুও তিনি বুঝতে পারলেন যে যে-কাজটা তিনি এই তিনদিন ধরে করলেন সেটা একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই না। পরশু মঙ্গলবার সকালে আসল অমলেশ মৌলিক এসে পৌঁছবেন। অরূপবাবু এ ক'দিনে এই কটি ছেলেমেয়ে এবং তাদের বাপ-মা মাসি-পিসির কাছে যে আদরযত্ন ভক্তি ভালোবাসা পেলেন, তার সবটুকুই আসলে ওই মঙ্গলবার যিনি আসছেন তাঁরই প্রাপ্য। মৌলিক মশায়ের লেখা যেমনই হোক না কেন, এদের কাছে তিনি একজন হিরো। তিনি যখন সশরীরে এসে পৌঁছবেন, এবং সী-ভিউ হোটেলের ম্যানেজার বিবেক রায় যখন সগর্বে সেই খবরটি প্রচার করবেন, তখন যে কী একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হবে সেটা ভাবতেই অরূপবাবুর আত্মারাম

খাঁচাছাড়া হয়ে গেল।

তাঁর পক্ষে কি তাহলে একদিন আগে পালানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে? না হলে মঙ্গলবার সকাল থেকে রাত্তির অবধি তিনি করবেনটা কী? গা ঢাকা দেবেন কী করে? আর সেটা না করতে পারলে এরা তাঁকে ছাড়বে কেন? ভণ্ড জোচ্চোর বলে তাঁর পিঠের ছালচামড়া তুলে দেবে না? আর মৌলিক মশাইও জানতে পারলে দু'ঘা না বসিয়ে ছাড়বেন কি? যণ্ডা মার্কা সাহিত্যিক কি হয় না? আর পুলিশ? পুলিশের ভয়ওতোআছে। এ ধরনের ধাপ্পাতে জেলটেল হয় কি না সেটা অরূপবাবুর জানা নেই, তবে হলে তিনি আশ্চর্য হবেন না। বেশ একটা বড় রকমের অপরাধ যে তিনি করে ফেলেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুশ্চিন্তায় ঘুম না হবার ভয়ে অরূপবাবু একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেললেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অরূপবাবু মঙ্গলবার রাত্রের ট্রেনেই যাওয়া স্থির করলেন। আসল অমলেশ মৌলিককে একবার চোখের দেখা দেখবার লোভটা তিনি কিছুতেই সামলাতে পারলেন না। সোমবার সকালে নিজের হোটেলেই খোঁজ করে তিনি গত মাসের যুগান্তরের সেই সংখ্যাটি পেয়ে গেলেন যাতে অমলেশ মৌলিকের ছবি ছিল। সরু গোঁফ, কোঁকড়ানো চুল, মোটা ফ্রেমের চশমা—এ সবই আছে, তবে মিলের মাত্রাটা সঠিক বুঝতে গেলে আসল মানুষটাকে চোখের সামনে দেখতে হবে, কারণ ছাপা পরিষ্কার নয়। যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তা থেকে তাঁকে চিনে নিতে কোনো অসুবিধে হবে না। অরূপবাবু স্টেশনে যাবেন। শুধু চাক্ষুষ দেখা নয়, সম্ভব হলে দুটো কথাও বলে নেবেন ভদ্রলোকের সঙ্গে: এই যেমন—'আপনি মিস্টার মৌলিক না? আপনার ছবি দেখলাম সেদিন কাগজে। আপনার লেখা পড়েছি। বেশ ভালো লাগে'—ইত্যাদি। তারপর তাঁর মালপত্তর স্টেশনে রেখে অরূপবাবু শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন। কোনারকটা দেখা হয়নি। মন্দির দেখে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে সোজা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চাপবেন। গা ঢাকা দেবার এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই।

মঙ্গলবার পুরী এক্সপ্রেস এসে পৌঁছল বিশ মিনিট লেটে। যাত্রী নামতে শুরু করেছে, অরূপবাবু একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রথম শ্রেণীর দুটো পাশাপাশি বোগীর দিকে লক্ষ রাখছেন। একটি দরজা দিয়ে দুজন হাফপ্যান্ট পরা বিদেশী পুরুষ নামলেন, তারপর একটি স্থূলকায় মারোয়াড়ী। আরেকটি দরজা দিয়ে একটি বৃদ্ধা, তাঁকে হাত ধরে নামাল একটি সাদা প্যান্ট পরা যুবক। যুবকের পিছনে একটি বৃদ্ধ, তার পিছনে—হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই, ইনিই অমলেশ মৌলিক। অরূপবাবুর সঙ্গে চেহারার মিল আছে ঠিকই, তবে পাশাপাশি দাঁড়ালে যমজ মনে হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। মৌলিক মশাইয়ের হাইট অরূপবাবুর চেয়ে অন্তত

দু' ইঞ্চি কম, আর গায়ের রং অন্তত দু পোঁচ ময়লা। বয়সও হয়ত সামান্য বেশি, কারণ জুলপিতে দিব্যি পাক ধরেছে, যেটা অরূপবাবুর এখনো হয়নি।

ভদ্রলোক নিজের সুটকেস নিজেই হাতে করে নেমে একটি কুলিকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন। কুলির সঙ্গে সঙ্গে অরূপবাবুও এগিয়ে গেলেন।

'আপনি মিস্টার মৌলিক না?'

ভদ্রলোক যেন একটু অবাক হয়েই অরূপবাবুর দিকে ফিরে ছোট্ট করে মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

কুলি সুটকেসটা মাথায় চাপিয়েছে। এছাড়া মাল রয়েছে অরূপবাবুর কাঁধে একটি ব্যাগ ও একটি ফ্লাস্ক। তিনজনে গেটের দিকে রওনা দিলেন। অরূপবাবু বললেন—

'আমি আপনার বই পড়েছি। কাগজে আপনার পুরস্কারের কথা পড়লাম, আর ছবিও দেখলাম।'

'ও।'

'আপনি সী-ভিউতে উঠছেন?'

অমলেশ মৌলিক এবার যেন আরো অবাক ও খানিকটা সন্দিগ্ধভাবে অরূপবাবুর দিকে চাইলেন। অরূপবাবু মৌলিকের মনের ভাবটা আন্দাজ করে বললেন, 'সী-ভিউয়ের ম্যানেজার আপনার একজন ভক্ত। তিনিই খবরটা রটিয়েছেন।'

'ও।'

'আপনি আসছেন শুনে এখানকার অনেক ছেলেমেয়েরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।'

'উঁ।'

লোকটা এত কম কথা বলে কেন? তার হাঁটার গতিও যেন কমে আসছে। কী ভাবছেন ভদ্রলোক?

অমলেশ মৌলিক এবার একদম থেমে গিয়ে অরূপবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'অনেকে জেনে গেছে?'

'সেইরকমই তো দেখলাম। কেন, আপনার কি তাতে অসুবিধে হল?'

'না, মানে, আমি আবার একটু একা থাকতে পপ্—পপ্—পপ্—'

'পছন্দ করেন?'

'হ্যাঁ।'

তোতলা। অরূপবাবুর মনে পড়ে গেল অষ্টম এডওয়ার্ড হঠাৎ সিংহাসন ত্যাগ করার ফলে তাঁর পরের ভাই জর্জ ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন তোতলা অথচ তাঁকেই রাজা হতে হবে, আর হলেই বক্তৃতা দিতে হবে।

কুলি মাল নিয়ে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে দেখে দুজনে আবার হাঁটতে শুরু

করলেন।

'একেই বলে খ্যাখ্-খ্যাতির বি—ইড়ম্বনা।'

অরূপবাবু কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন এই তোতলা সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ করে ঝুনি পিন্টু চুমকি শান্তনু বাবুন প্রসেনজিৎ আর নবনীতার মুখের অবস্থা কীরকম হবে। কল্পনায় যেটা দেখলেন সেটা তাঁর মোটেই ভালো লাগল না।

'একটা কাজ করবেন?'—গেটের বাইরে এসে অরূপবাবু প্রশ্ন করলেন।

'কী?'

'আপনার ছুটিটা ভক্তদের উৎপাতে মাঠে মারা যাবে এটা ভাবতে মোটেই ভালো লাগছে না।'

'আমারও না।'

'আমি বলি কী আপনি সী-ভিউতে যাবেন না।'

'তাৎ-তাহলে?'

'সী-ভিউয়ের খাওয়া ভাল না। আমি ছিলাম সাগরিকায়। এখন আমার ঘরটা খালি। আপনি সেখানে চলে যান।'

'ও।'

'আর আপনি নিজের নামটা ব্যবহার করবেন না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি গোঁফটা কামিয়ে ফেলতে পারেন।'

'গোঁ-গোঁ—?'

'এক্ষুনি। ওয়েটিং রুমে চলে যান, দশ মিনিটের মামলা। এটা করলে আপনার নির্ঝঞ্ঝাট ছুটিভোগ কেউ রুখতে পারবে না। আমি বরং কাল কলকাতায় ফিরে আপনার নামে সী-ভিউতে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেব আপনি আসছেন না।'

প্রায় বিশ সেকেণ্ড লাগল অমলেশ মৌলিকের কপাল থেকে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হতে। তারপর তাঁর ঠোঁটের আর চোখের দুপাশে নতুন রেখা দেখা দিল। মৌলিক হাসছেন।

'আপনাকে যে কিক্-কি বলে ধ-ধ-ধ—'

'কিচ্ছু বলতে হবে না। আপনি বরং এই বইগুলোতে একটা করে সই দিন আসুন এই নিমগাছটার পেছনে—কেউ দেখতে পাবে না।'

গাছের আড়ালে গিয়ে ভক্তের দিকে চেয়ে একটা মোলায়েম হাসি হেসে পকেট থেকে লাল পার্কার কলমটি বার করলেন অমলেশ মৌলিক। প্রাইজ পাবার দিনটি থেকে শুরু করে অনেক কাগজ অনেক কালি খরচ করে তিনি একটি চমৎকার সই বাগিয়েছেন। পাঁচটি বইয়ে পাঁচটি সই। তিনি জানেন যে তাঁর জিভ তোতলালেও কলম তোতলায় না।